নিঃশেষে আত্মনিবেদনেই ভক্তির পূর্ণতা

রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্তরের অনুধ্যানঃ ব্রহ্মসাগরের উপান্তে যেমন তার অস্তিত্বের বোধটি প্রবল হয়, তেমনি আকর্ষণও হয় তীব্র। ভগবানকে স্মরণে, মননে, নিভৃত সাধনে বরণ করে নেওয়ার উদ্যোগ যতই তীব্রতর হতে থাকে, ততই এগিয়ে আসে তাঁর পরশ, তাঁর আবির্ভাব পর্ব। সূর্যের উদয়ের মতই যতই উদয় হতে থাকে ভাগবতী মাধুর্য, এগিয়ে যায় তাঁর দিকে মনন ও অভিনিবেশ, তাঁর কাছে সমর্পণের স্পৃহা, সমর্পণ পর্ব যেমন এগিয়ে চলে, তেমনই আসে আহ্বানপর্ব। উষার সূর্যের উদয়টি যেমন স্নিগ্ধ, কোমল এক অনাবিল পরশে এগিয়ে চলে, তেমনি এগিয়ে চল সব অনুভূতির প্রবাহকে। অনুভূতির প্রবাহকে সঙ্ঘত করে এগিয়ে নিয়ে চল নিজের মনের অঙ্গনে। নিজের মনের অঙ্গনে গড়ে তোলে ঐ আবহ। অন্ধকারের সব বাধা পেরিয়ে এগিয়ে আসুক ঐ আলোর রথ। আলোয় আলোময় এক অনবদ্য সৃষ্টি মনের জগৎকে করবে অধিকার। জগতের দুঃখ, যন্ত্রনা, হাসি, কান্নার ছেদ ঘটে গিয়ে উদ্ভাসিত হয় এক অনুপম আনন্দের ছন্দ। অপৌরুষেয়, অচিন্ত্য, অনির্বচনীয় ক্রমে ছোঁয়া ধরার আবর্তে এসে স্বাভাবিক জীবন ছন্দে লীলাময়, লীলা ভাস্বর হয়ে ওঠেন। যেমন নিশ্চল , নিচেষ্ট স্বয়ংই গতির আবর্তে পড়ে গতিময় হয়ে ওঠেন, যেমন জড়তনু বায়ুর তাড়নে বায়ুবাহিত হয়ে গমনে তৎপর হয়ে ওঠে; যেমন হস্তপদবিহীন অবয়বের মাধুর্য ফুটে ওঠে বিস্তারের প্রাবল্যে; তেমনই সূর্যোদয়ের আলোর স্নিগ্ধতা ও গতি নিয়ে এগিয়ে চলে জীবনের সব আগ্রহ ও সঞ্চার। ভগবানকে বরণ করেছে যে মন, তার ঝরে গিয়েছে সব মালিন্য। হয়েছে তার এক অনবদ্য সৃষ্টির সম্ভাবনা যার সূত্র ধরেই এগিয়ে চলবে জীবনের শাশ্বত তরণী। এ আবাহন জীবনের সব অনবদ্য মুহূর্তগুলিকে সংহত করে এক মহাজীবনকে বরণ করে নিয়ে মহাজীবনের অঙ্গীকারে যুক্ত হওয়া। শ্রীজগন্নাথের চরণে প্রণতি তাঁর ঐ দারুব্রহ্ম স্বরূপকে বরণ করেই নেওয়া। পুরুষোত্তমকে জীবনে বরণ করে নেওয়াই হল তাঁকে জীবনের পটে মূর্ত হওয়ার জন্য অবাধ ক্ষেত্র উন্মোচন করা।

হৃদয়পুরে আহ্বান ও ধারণ করাই সাধন সম্মত। পুরুষোত্তমকে ধারন করবার সাধ্য কার? তনি স্বয়ং ধারণোপম হয়ে হৃদয়ে পুরবাসী হন। হৃদয়ের স্পন্দনে নন্দিত হয়ে হৃদয় রাজ্যের অধিকারকে তিনি ক্রমে সংহত করে নেন। মনের সব ছড়ানো বিচ্ছুরণ থেকে মন গুটিয়ে আসে তাঁর অভীপ্সার উপান্তে। যিনি ঐ শান্ত অথচ তরঙ্গায়িত পথের নিশানায় নিয়ে যান, যিনি অনাবিল, অফুরন্ত এক উন্মোচন প্রসাদ এনে দেন, যিনি গতির প্রাবল্যে বিরাজ করেন পূর্ণ স্থিতির আবহে, যিনি পূর্ণ উন্মোচিত অথচ হৃদয়পুরবাসী হয়ে চিরগুপ্ত- ঐ অনাবিল প্রেমপ্রবাহ মধুময় হয়ে যিনি মধুবিস্তারে মগ্ন তাঁকে বরণ করে নাও হৃদয়তন্ত্রীর সব স্পন্দনে। যে সুধা হয়েছে তাঁর পরশে সঞ্চিত, ঐ সুধার বিস্তারে তাঁকে বরণ করে নিতে হয়। দুঃখে, বেদনায়, জীবন চাঞ্চল্যে তাঁর অপরিসীম ভালবাসার মাধুর্যে গড়ে ওঠে জগতের সব বিস্তার পট। তিনি যেমন অমূর্ত থেকে মূর্ত প্রকাশে আসেন, তেমনই আবার মূর্ত থেকে হয় অমূর্তে তাঁর প্রবাহ। এরই মাঝে বিঝে নিতে হয় তাঁকে। জেনে নিতে হয় তাঁরই এই প্রবাহ ধারাকে।

আচার্য শঙ্কর, আচার্য রামানুজ উভয়েই নিজ নিজ ভাবের প্রবাহে হয়েছেন প্রবাহিত, প্লাবিত করেছেন অনুরাগী হৃদয়কে, এসেছে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে একই আবাহনে-'জগন্নাথস্বামী, নয়ন পথগামী ভবতু মে-।' মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভাগবতী প্রকাশে প্রেমের গূঢ়তম প্রকাশকে অন্তরঙ্গজনের কাছে করেছেন উন্মোচন জগন্নাথস্বামীর বাতায়নে। শ্রীজগন্নাথধামে দারুব্রহ্মের মহাপ্রকাশ সব প্রকাশকে উন্মোচন করে সচল সশক্তিক ভাগবতীরূপের কৃপাবর্তনকে করেন উন্মোচিত। শ্রীজগন্নাথের রূপপ্রকাশটি কবির চেতনায় শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হয়েই পড়েছে ধরাঃ

ঈশ্বর উপরে ঈশ্বর। পরম পরে পরাপর।।

ব্রহ্ম উপরে ব্রহ্ম এহি। কৃষ্ণ উপরে কৃষ্ণ সেহি।।

অনাদি উপরে অনাদি। সর্বকারণ সিদ্ধি।

শ্রীজগন্নাথ শ্রীমূরতি। এথঁটি সর্ব উৎপত্তি।। (দিবাকর দাস, "জগন্নাথচরিত")

জগন্নাথরূপঃ রূপের প্রকাশ ক্ষণটি ভগবান ভক্তের সাযুজ্যের ক্ষণ। যে রূপের আকাঙ্ক্ষা জেগেছে হৃদয়ে, ঐ রূপের প্রাবল্য ঘটবে হৃদয়ের তন্ত্রীতে। সাধন প্রয়াসটি চেতন উন্মোচনের পর্ব করে উন্মোচন। সাধন প্রয়াসের দ্বারা ঐ রূপের আবরণ হয় উন্মোচিত। রূপের আবরণ উন্মোচনের পথটি সামগ্রিক হয়ে উঠতে পারে, অথবা থাকতে পারে তাৎক্ষণিকে। তাৎক্ষণিকের প্রয়াস এই মুহূর্তের চেতন সত্তার বিকাশে অঙ্গীকৃত হওয়া। যা কিছু রূপের প্রকাশ রয়েছে, শ্রীজগন্নাথ রূপ সব রূপকে বরণ করে নিয়েও সব রূপের সীমা অতিক্রম করেছেন। নিশ্চল, হস্তপদ বিহীন হয়েও তিনি সব ঈশ্বর প্রকাশকে অতিক্রমকারী এক মহাপ্রকাশ।

অপাণি পাদঃ জবনঃ গ্রহীতা

পশ্যতি অচক্ষুঃ সং শৃণ্যোতি অকর্ণঃ।

সঃ বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্য অস্তি বেত্তা

তম্ আহুঃ অগ্রং পুরুষম্ মহান্তম্।। (শ্বেত. উপ. ৩/১৯)

তাঁর হাত নেই অথচ তিনি সব নিবেদনই গ্রহন করেন। তাঁর পা নেই, অথচ তিনি নিত্যই চলেছেন দূরবিস্তৃত পথে। তাঁর চক্ষু নেই, অথচ তিনি অন্তরে-বাইরে সূক্ষ্মে স্থূলে সবই দেখেন। তাঁর কান নেই অথচ তিনি সবই শোনেন; তিনি সব জ্ঞাত রয়েছেন, সবই তিনি জানেন, কিন্তু তাঁকে কেউ সঠিকভাবে জানে না। তিনি আদি পুরুষ, তিনি মহান।

ইনিই শ্রীজগন্নাথ, পুরুষোত্তম। 'সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিতম' এবং 'সর্বেন্দ্রিয় গুনাভাসং'। তিনি ইন্দ্রিয় বিবর্জিত হলেও সকল কর্মাদি, প্রয়াস তাঁরই নিত্য মহিমা। শ্রীজগন্নাথের আশ্রয়ে রয়েছে সব ভক্তি ও প্রেমের উৎস শ্রীজগন্নাথের এই অপাণিপদ হয়ার মূলে রয়েছে তাঁর অসীমতা। তাঁর আদি নেই, অন্ত নেই- ইনি অনাদি অনন্ত, সর্বাবস্থায় একই চেতন সত্তা। তিনি চেতন দীপ্ত, চেতন সঞ্চারী।

'যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মাতি বেদান্তিনঃ।

বৌদ্ধাঃ বুদ্ধেতি প্রমাণপতয়ঃ কর্তোতি নৈয়ায়িকাঃ।

অহর্ন্নিত্যং জৈন শাসনরতাঃ কর্মেতি মীমাংসকাঃ।

সোহয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথোহরিঃ।' (শ্রীজগন্নাথ, জগন্নাথ মহিমা)

(যিনি স্বতঃই নানা রূপে প্রকাশিত, শৈবগন যাঁকে শিব রূপে উপাসনা করেন, যিনি বৈদান্তিকদের পরম ব্রহ্ম, বৌদ্ধদের কাছে যিনি বুদ্ধ, প্রমানপটু নৈয়ায়িকরা যাঁকে কর্তা বলে উল্লেখ করেছেন, জৈনদের কাছে যিনি আদি নিত্য অর্হৎ, মীমাংসকদের নিকটদের নিকট যিনি কর্ম, সেই ত্রৈলোক্যনাথ হরি সাধন ফল দান করুন।)

তিনি শান্ত, শাশ্বত, শিবরূপে প্রকাশিত; তিনি পূর্ণ ব্রহ্মরূপে বিরাজিত ঐ হস্তপদ বিহীন দেব অবয়বে। তাঁকে যেমনভাবে ভাবনা করা হয়েছে, যেমন এসেছে তাঁর প্রতি আগ্রহ ও আকুলতা তেমনই হয়ে ওঠে তাঁর উপলব্ধি ও ভক্তিধন লাভ।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদঃ তত্ত্বং যৎ জ্ঞানম্ অদ্বয়ম্।

ব্রহ্ম এতি পরমাত্মা এতি ভগবান এতি শব্দ্যতে।। (ভাগবৎ, ১/২/১১)

(যাঁরা জ্ঞানমার্গী তাদের মধ্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে অভেদ, অখণ্ড ও সচ্চিদানন্দের মধ্যে পরিচয় খুঁজে নেন অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের। এই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান রূপের উন্মোচন করেন।)

তাঁকে যেমনভাবে অভিপ্রায় করা যায়, যেমনভাবে হতে থাকে তাঁর জন্য সাধন প্রয়াস, তার তেমনই হয়ে ওঠে বোধ ও পরিণতিতে উপলব্ধি। হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হলে ক্রমে জ্ঞানের পূর্ণতা আসে।

এবং প্রসন্ন মনসঃ ভগবৎ ভক্তি যোগতঃ।

ভগবৎ ত্তত্ব বিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে। (ভাগবত, ১/২/২০)

(ভক্তিরসে স্নাত হৃদয়ে পার্থিব সব আকর্ষণ ধৌত হয়ে ভক্তির লতা জাগ্রত হয়। আনন্দ আপ্লুত হৃদয়ে এক ব্রহ্মতত্ত্ব আপনা থেকেই অনুভবের সীমায় এসে যায়।)

নববিধাভক্তিঃ ভাগবতী ও চৈতন্য ভাবধারায়ঃ হৃদয় রাজ্যে অন্য প্রভাব যতসময়ে থাকবে ভগবানের প্রতি ভক্তিতে মন, হৃদয় সব সংযোজিত হয়ে যখন পূর্ণ ভগবত্তা প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তখনই ক্ষণ ভক্তির শ্রীবৃদ্ধির। বৈষ্ণব শাস্ত্র ভক্তির নানা ধাপ নির্দিষ্ট করেছেন। নয়টি বিভিন্ন ধাপে বিন্যস্ত ভক্তিকে নববিধা ভক্তি বলা হয়। এই নববিধাকে বিন্যাস করা হয়েছে এভাবেঃ

শ্রবন—কীর্তন—স্মরণ—পাদসেবন—অর্চন—বন্দন—দাস্য—সখ্য—আত্মনিবেদন।

এই নববিধা বিন্যাসকে ব্যক্ত করা যায় ভক্তিলাভের উপায়স্বরূপ নানা স্তররূপে। এই স্তরগুলির প্রত্যেকটি ভক্তির ডালা উন্মোচক। ভক্তিরস উদ্রেক করে এবং ভক্তির ধারা উন্মোচন করে। ভক্তির ধারা উন্মোচিত হলে ভক্তির প্রবাহ স্বতঃই আসে যদি মনের পটভূমিটি উপযুক্ত হয়। গুণাশ্রিত মন ভক্তিকে বেশি সময় ধারণ করতে পারে না। গুনাশ্রয়ে ভক্তির সঞ্চার হয় কিন্তু ভক্তির প্রাবল্য আসে না।গুনাশ্রিত মন ভক্তিকে ক্ষনিকের প্রয়াসে ধারণ করতে পারে মাত্র,-এর ব্যাপ্তির জন্য এটি উপযুক্ত নয়। মহাপ্রভু ভক্তির নববিধাকে সাধ্য-সাধন ত্তত্বের মধ্য দিয়ে ভক্তমন্ডলীর কাছে উন্মোচন করেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে রায় রামানন্দের তত্ত্বালোচনায় ফুটে উঠেছে এই তত্ত্বটি। নববিধার যে পরিচয় মহাপ্রভু দিয়েছেন, সেটিঃ

স্বধর্মাচরণ—কৃষ্ণেকর্মার্পণ—স্বধর্মত্যাগ—জ্ঞানমিশ্রাভক্তি—জ্ঞানশূন্যাভক্তি—প্রেমভক্তি—দাস্যপ্রেম—সখ্যপ্রেম—কান্তাপ্রেম।

নবাবিধা ভক্তির সাধারণ বৈষ্ণবীয় ধারা এবং মহাপ্রভুর ধারার মধ্যে রয়েছে তফাৎ। শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ দ্বারা মানুষের ভাগবতী স্পৃহা জাগ্রত হয়। শ্রবণ সাধন পথ হিসেবে উত্তম। শ্রবণ প্রক্রিয়াটি হল শ্রী ভগবানের নাম শ্রবণ; ভাগবতী লীলাশ্রবন; ভগবানে সমর্পিত শ্রবণ ক্রিয়া। এই সাধন মার্গে, নিজের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগদ্বারাই শ্রবণ ক্রিয়াকে যোজন করতে হবে। শ্রবণ-ক্রিয়াটি ভগবানে সমর্পনের প্রক্রিয়া হল জাগতিক বিষয়াদির প্রতি শ্রবণগুরুত্ব ক্রমে কমিয়ে নিয়ে এসে ভাগবতী শ্রবণকে বেশি মূল্য দেওয়া। 'আমি শুনতে চাই তোমার ঐ দীপ্ত বাণী।''তোমায় তোমার ভাবপ্রবাহে, তোমার বাণীর নন্দনে নিত্য পেতে চাই শ্রবণ অভিজ্ঞতায়।'ভাগবতী অভিজ্ঞতায় শ্রবণ-নন্দন ক্রমে ভাবতন্ময়তাকে বাড়িয়ে তোলে। ভাবতন্ময়তার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে নিত্য অনুভূতি ও উপলব্ধির প্রাচুর্য। অনুভুতি ও উপলব্ধির যে পর্ব সূচিত হয় শ্রবণ দ্বারা, এরই স্ফূর্তি আসে কীর্তনে। কীর্তনে শ্রুতিপ্রসাদ যেন আত্মস্থ হয়। যেটি এ পর্যন্ত শ্রবণে ছিল সীমিত, যার উৎস ছিল অন্যত্র; সেটি এখন হয়ে উঠবে নিজের। অনুভবের পর্বে কীর্তন হল নিজ সংযোজন। কীর্তনে রয়েছে নন্দন প্রয়াস, ভগবানকে অনুভবের আয়নায় নিত্য আবাহন করা। ভগবানকে কীর্তনের দ্বারা আহ্বান করা। আহ্বান করার পিছনে নিজের সব সংযোজন রয়েছে। কীর্তনে রয়েছে ভাব, ভাষা রুচি এবং বিন্যাস। কীর্তনের ভাবটি স্থায়ী হয়ে নিজ হৃদয়ে বিরাজ

করে। কীর্তনের ভাষায় রয়েছে অনুভব প্রকাশের অনুপম মাধুর্য। অনুভব প্রকাশের মাধুর্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে ভাবের সৃষ্টি। ভাব যে ভাষাকে রচনা করে তার মধ্যেই ক্রমে ফুটে উঠবে নিবেদনের পর্বটি। অথচ এই ভাষা এবং শব্দ চয়নের মধ্যেনিহিত রয়েছে স্বভাব ও রুচি। স্বভাব ও রুচি ক্রমশই ভাব ও ভাষায় সমন্বিত মাধুর্য হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রদেশ থেকে হয় উৎসারিত। তাই যতই আত্মস্থ হয়ে উঠবে ভগবানের ভাব ততই ঘন সংঘবদ্ধ হবে ভাষার মাধুর্যটি। ভাব, ভাষা ও রুচির দ্বারা বিন্যাসটি কীর্তনে মূর্ত হয়ে ওঠে।

স্মরণ—পাদসেবন—অর্চন—বন্দন এই সাধন পর্বের মধ্যে রয়েছে ক্রমে শ্রীভগবানের প্রকাশ মূর্তির সান্নিধ্যে চলে আসা। শ্রবণ—কীর্তনে তাঁর সঙ্গে দূরত্বকে অঙ্গীকার করে নিয়েই এগিয়ে চলতে পারে সাধন। স্মরণপর্বও দূরত্বে সম্ভব। স্মরণে এক চিত্র মনের পটভূমিতে হয় রচিত। স্মরণে মনের পটে বিরচিত এক অনুপম চিত্র প্রবাহ। স্মরণ যতই গাঢ় ও তীব্র হয়, ততই জাগে স্মরণ মাধুর্য। অথচ, পাদসেবন আরও গাঢ় ও নিবিড়। পাদসেবনের দ্বারা ভগবানের মাধুর্যকে আবাহন করা হয়। ভগবানের পাদসেবনের প্রথম শর্ত হল ঐ ভাগবতী পাদ পরিচয় লাভ। তাঁর চরণ চিহ্ন ধরে এগিয়ে চল ঐ চরণ সন্ধানে। চরণ স্মরণ করেই চিহ্ন দেখতে হয়। চরণ স্মরণ করে চরণ চিহ্নকে আবিস্কার করে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে চরণের সান্নিধ্যে। চরণ প্রাপ্তীই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তী। যদি কৃষ্ণচরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় কৃষ্ণকৃপায়। তাই পাদসেবার অধিকার লাভ বড় বিষয়। পাদসেবনের অধিকারটি আসতে পারে একমাত্র তাঁরই কাছে তাই পাদসেবনটি একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিমূলক কার্য নয়, এটি ভগবানের কাছে নিজের নিবেদন পর্বেরই অঙ্গ। পাদসেবন ঐ শ্রীপাদদর্শন ও শ্রীপাদলাভযুক্ত। তাঁর চরণ দর্শন ও চরণ লাভ একবার অঙ্গীভূত হলে চেতন রাজ্যে ঐ চরণের উন্মেষ ঘটে। চরণ চিহ্ন হৃদয়পটে প্রকাশিত হলেই পাদসেবার পটভূমিটি সৃষ্টি হয়। পাদ সেবার পটভূমিযখন রচিত হল সেই হল ক্ষণ যেথায় পাদসেবার সুযোগ ও অধিকারটি এগিয়ে আসে সাধকের কাছ চরণ স্মরণ যতই তীব্র হবে ততই হয়ে উঠবে পাদসেবার এক অনুপম ক্ষণ।এস, সকলে কৃষ্ণ চরণ স্মরণে নিবদ্ধ হই। চরণ চিহ্ন ধরে এগিয়ে চলি সচল ওই চরণের স্থিত ক্ষণে। যেখানে তিনি বিন্যাস করেছেন তাঁর ঐ রাতুল চরণ, ঐ রাতুল চরণকে ধ্যান করতে হয়। জ্যোতর্ময় এই চরণ। চরণে আশ্রিত রয়েছে সমগ্র সৃষ্টি, সমগ্র বিকাশ, সমগ্র উন্মেষ। ধ্যানে, নিবিড় আবেশে ঐ চরণকে হৃদয়ে ধারণ করতে হয়। ঋষি বলেছেনঃ

ওঁ সৎ চিৎ আনন্দঃ রূপায়ঃ

কৃষ্ণায় অক্লিষ্ট কারিণে।

নমঃ বেদান্ত বেদ্যায়

গুরবে বুদ্ধি সাক্ষিনে।। (গোপালপূর্বতাপনী উপ.১/১)

(সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং সকল আনন্দের উৎস ও নিনাদভূমি। বেদান্তের মূর্ত প্রকাশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম করবার উপযুক্ত বুদ্ধিযোগ উৎসারিত হোক ঐ ভক্তহৃদয়ের ডালি থেকে।)

হে কৃষ্ণ, করুনাসিন্ধু, দীনবন্ধু, জগৎপতি তোমার কৃপার উন্মোচনে ঐ চরণের স্বরূপ উন্মোচন হোক ভক্ত জীবনের পটে। এস, ঐ চরণে নিবিড় প্রণতিটি নিত্য নিবেদন করি। শ্রীকৃষ্ণ চরণ সেবার অনুক্ষণ সংবেদ আকূতি।

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদ্রা।

বাসুদেবে ভগবতি কুর্বন্তি আত্মপ্রসাদনীম্।। (ভাগবত, ১/২/২২)

(যিনি কৃপাপ্রাপ্ত হয়ে জেনেছেন্ তাঁকে, তিনি সর্বদাই আনন্দ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের ঐ পরম রূপকে ভজনা করে আত্মার আনন্দ বর্ধন করেন ভাগবতী প্রসাদে।)

চরণচিহ্ন ধরে এগিয়ে গিয়ে নিয়ে নাও ওই চরণে আশ্রয়। এখন তাঁর পাদসেবার ক্ষণ। এই পাদসেবার জন্য এসেছে ক্ষণ। বেজেছে মঙ্গল ধ্বনি, জাগতিক প্রাণ উঠুক জেগে, হোক রসদীপ্ত। ঐ মঙ্গল ধ্বনির নিনাদ ক্ষণটি এখন ভগবানের আশ্রয়ের ক্ষণ, তাঁর সেবার ক্ষণ, তাঁকে আরও নিবিড় আবেগে হৃদয়ে ধারণ করবার ক্ষণ এখন। নিবিড় মনোনিবেশ, নিবিড় আবেদন, নিবিড় নিবেদনে তাঁকে বরণ করে নেওয়া যতই তীব্র হয়ে উঠবে, ততই হবে ঐ পাদ উন্মোচন। উন্মোচিত পাদ সেবার দায় এখন ভক্তের। এজন্য চাই ভক্তির উন্মেষ। ভক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে হৃদয়ের মাঝে।

'সা কস্মৈ উচিৎ পরমা প্রেমরূপা।' (নারদীয় ভক্তিসূত্র,২)

যা কিছু তাঁর প্রতি উপযুক্তভাবে পরম প্রেমসঞ্চারকারী, তাই ভক্তি।)

'সা পরঃ অনুরক্তি ঈশ্বরে' (শান্ডিল্য সূত্র। ১/২)

(ভগবানের প্রতিঅপরিসীম অনুরক্তিই ভক্তি।)

ভক্তির জাগরণ ঘটলে হৃদয়ের উন্মোচন হয়। এখন ঐ চরণের অনুভূতি হৃদয়ে এসে যায়। ঐ শাশ্বতী ভাগবতী মায়ের শ্রীচরণ স্মরণ যেমন। জ্যোতির্ময় ওই চরণ। যেন শত চন্দ্রের মহিমায় ভাস্বর হয়েছে মায়ের চরণটি। সুবর্ণ জ্যোতির্ময় ঐ চরণ নিত্য ভাগবতী দ্যুতিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে। হে মাতা, তোমার ঐ চরণের আশ্রয় এই প্রাণ। যে প্রাণের দীপ্তি ঐ চরণে নিহিত, সে প্রাণও ঐ চরণের সেবালাভের আকাঙক্ষী। চরণের জ্যোতিমাধুর্য এখন হৃদয়কে আহ্বান জানিয়ে চলেছে নিত্যই ওই চরণের সেবার জন্য। ঐ চরণে যেমন নিহিত রয়েছে শত চন্দ্রের শোভা, তেমনিই রয়েছে শত সূর্যের দীপ্তি ও প্রভা। শত সূর্যের ঐ দীপ্তি জীবনের সব উপাদান ও সংবেদকে সংহত করে এখন করতে হবে নিবেদন। যে হৃদয়ে; মায়ের হৃদয় স্পন্দন যেখানে হয়েছে আনন্দমুখর ঐ হৃদয় ভগবানের কাছে নিবেদনের এই ক্ষণে আগত। নিবেদনটি তাঁকে বরণ করে, তাঁর সেবায় উপযুক্ত হয়ে ওঠার। তাই যেখানে রয়েছে অপূর্ব সুন্দর সুষমামন্ডিত এক অনুপম স্ফূর্তি, সেই অনুকূল হৃদয়ের কাছে ঐ চরণের চন্দ্রশোভার উন্মেষ, প্রতিকূলের কাছে উন্মোচিত হয়ে উঠবে সূর্যতাপ ও দীপ্তি। মায়ের চরণেই আশ্রয় সকলের। অর্চন ও বন্দন পাদসেবার পরিণতি এনে দেয়। সেবার পরিণতি রয়েছে ঐ চরণে অর্চনায় ও বন্দনে। বন্দনায় ঐ চরনের সেবা হয়ে উঠবে পরিণত, পূর্ণ।

দাস্য-সখ্য-আত্মনিবেদনে রয়েছে ভক্তির ক্রম বিস্তারকারী সীমা।

অয়ি নন্দতনু! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।

কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ স্থিত ধূলীসদৃশং বিচিন্ত্য।। (শিক্ষাষ্টক-৫, শ্রীচৈতন্য)

(আমি তোমার নিত্যদাস হে নন্দতনয়, কৃষ্ণ; বিষম এই জীবন তরঙ্গ সাগরে হয়েছি পতত তোমার ঐ শ্রীচরণ শরণ করেছি, কৃপা করে চরণের ধূলি সদৃশ করে নাও।)

দাস প্রকাশটি যেন ঐকান্তিক আশ্রয়ে এনে দেয়। ঐকান্তিক আশ্রয়টি ভগবানকে নিত্য স্মরণের এক অনুপম ক্ষণ ও সম্ভাবনা এনে দেয়। হে প্রভু, তোমার চরণের ধূলিকণাকে চরণের দীর্ঘ আশ্রয়ে ঠাঁই দাও। দাস্যের বিড়াম্বনা যেন তোমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

ত্বং একং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং

পঞ্চপদং বৃন্দাবনে সুরভুঃ অতল আসীনং

সততং সমরৎ গণোঃ অহং

পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি।। (গোপাল পূর্ব তাপনী উপ. ১/৮-খ)

(ঐ গোবিন্দরূপে নিহিত রয়েছে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। বৃন্দাবনের পথে পথে যিনি তাঁর সঞ্চারকে অমৃতময় এক সংবেদে ব্যাপ্ত করেছেন নিবাদিত ভক্ত হৃদয়ে, তাঁকে সতত বন্দনা করি)

বৃন্দাবনের ধূলিকণা হয়ে বিরাজ করেছে এ হৃদয়। কৃষ্ণের পদচারণা আর কৃষ্ণপ্রিয়ার কৃষ্ণান্বেষকে মূর্ত করে তুলেছে হৃদয় তন্ত্রীতে কৃষ্ণ বন্দনায় আকুতি দিয়ে। তুমি বরণ করে নাও আলিঙ্গনে, সখ্যতায়।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাং ভক্তিঃ অহৈতুকী ত্বয়ি।। (শিক্ষাষ্টক-৪, শ্রীচৈতন্য)

(হে প্রভু, তোমার ঐ সম্পদ, জনপ্রসাদ, প্রকৃতির দীপ্তি, কবিতার রস চাই না। হে জগদীশ, তোমার প্রতি জাগ্রত ও স্থিত হোক অহৈতুকী ভক্তির প্রসাদ; জন্ম জন্মান্তিক্রমে)

ভক্তির পূর্ণতায়ঃ আত্মনিবেদনের মধ্যে রয়েছে তাঁকে মূর্ত প্রসাদে লাভ। তাঁর কাছে, তারই প্রসাদে মিলন দ্যুতিতে ভরপুর হয়ে ওঠা। এই মিলনভূমিই ভক্তির পরাকাষ্ঠা। এখানে রয়েছে নিত্য বৃন্দাবন মনে নিত্য কৃষ্ণ। যখন ব্যাকুলতা মূর্ত হয়ে ওঠে, তাঁকে না পেলেই নয়, তিনি বিহনে জীবন সচল হয়েও অচল, জীবনে সবকিছু থেকেও কিছু নেই; সবকিছু পেয়েও কিছু পাওয়া হয়নি। সব সম্পদে ভরপুর প্রাণও পূর্ণ রিক্ততায় বিধৃত। নিঃস্ব, রিক্ত সংবেদে জীবনের সব উপাদান যেন উপস্থিত হয়েও অনুপস্থিত। ঐ শাশ্বত, নিত্য সনাতনকে বরণ করে নিয়েও তাঁর ক্ষণিক অনুপস্থিতির কারণে তীব্র বিরহ বেদনা। বেদনাবিধুর মন তাঁর সঙ্গএমনভাবে চায় যে সঙ্গের উষ্ণতায় উদ্দীপ্ত হয়ে প্রাণে সঞ্চারিত হয় এক নবীন সূত্র।এসো, এসো হে জীবন দেবতা, জীবনের সব অঙ্গে অঙ্গে আনন্দ সঞ্চার কর তোমার ঐ অমৃতমুখর স্পর্শের মাধুর্যে। তোমার ঐ মাধুর্যটি ঝড়ে পড়ুক জীবনের সব অঙ্গে, অঙ্গের অনুসঙ্গে। তনুর তন্ত্রীতে, অণুতে সঞ্চারিত হোক তোমার মূর্ত ও দিব্য দ্যোতনা। তুমি মূর্ত হও, তোমার স্পন্দনে স্পন্দিত হোক হৃদয় তন্ত্রী, আর সব অঙ্গের উপাদান। মিলনের এই দ্যোতনা প্রাণের স্পন্দনকে বরণ করে নিয়ে অস্তিত্বের সর্বত্র হোক ব্যাপ্ত। হে নাথ, তোমার উপস্থিতিই ভাগবতী প্রসাদ এনে দেয় জীবনে। মহাজীবনের মূর্ত সন্দেশ নিয়ে আসে এই জীবনের সব বিগ্রহ সঞ্চারী অনুভূতি। তনুর তন্ত্রীতে মায়ের স্পন্দন নন্দিত হয়ে সব অনুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কণাগুলির মধ্যে নিয়ে আসুক মায়ের জন্য আকুতি। এক তনুর অভ্যন্তর থেকে স্পন্দিত হোক সহস্র, লক্ষ জীবনকণা। ঐ জীবনকণা সমূহ ভরপুর হয়র উঠুক মায়ের স্পর্শে, মায়ের জন্য পরম আকুতি শুধুমাত্র মনের পটে, হৃদয়ের সীমায় নয়, ছড়িয়ে পড়ুক সব অণুর অন্দরে, সব কণার কন্দরে। হে মূর্ত মহাপ্রকাশ, তোমার ঐ মাতৃপরিচয়টি শত চন্দ্রের সুষমাকে অতিক্রম করে মনের প্রশান্তি ও আনন্দ সঞ্চারী; আবার শত সূর্যের শৌর্য ও দীপ্তিতে ভাস্বর তোমার এই জগৎ প্রকাশ সব প্রকাশকে প্রাণবন্ত ও বর্দ্ধনশীল করে রেখেছে। তোমার প্রকাশই অন্য সব প্রকাশকে মূর্ত করে তোলে চির প্রকাশশীল করে তোলার জন্যই। তাই জগতের কর্ম, উদ্যোগ, বিন্যাস, বিস্তার সবের সঙ্গে রয়েছে তোমাকে বরণ করে নেওয়ার এক অন্বয়ী সাধন। নিজ অন্বয়কে বরণ করে নিতে হবে ঐ শাশ্বত ভগবত্তার মাতৃপ্রকাশের সঙ্গে। তিনি মূর্ত নিত্য ভগবত্তায়, তিনি মূর্ত অনুপম একাত্মতায়।

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবিষায়াম্।

শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে।। (শিক্ষাষ্টক-৭, শ্রীচৈতন্য)

(চক্ষের নিমেষের তরে যদি তোমার অদর্শন হয়, হে কৃষ্ণ, তোমার বিহনে সমগ্র জগৎ শূন্যবোধে হয় যুগান্তব্যাপী।)

ভক্তির চূড়ান্ত অবস্থায় এমন ঐকান্তিক প্রেম সঞ্চার মহাভাবেরই লক্ষণসূচক। ভক্তির এই অবস্থা সব প্রাপ্তি ও মোক্ষকে অতিক্রম করে প্রেরণা সঞ্চারকারী। হে জগন্নাথ, তোমার প্রকাশ ও উপস্থিতি বিহনে শূন্য এ জগৎ যেন তোমাকে খুঁজে ফেরে অনুক্ষণ—'জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী, ভবতু মে'। তোমার ঐ মহান উপস্থিতির কাছে ছুটে চলেছি এক অদৃশ্য চৌম্বকীয় আকর্ষণে। হে দেবতা, জীবনদেবতা হয়ে জীবনের পটে অবস্থান কর এমনভাবে যে তোমার বিরহ এ জীবন অনুভব না করে, অথচ তোমার অভাব জীবনের কাছে শূন্যতার অনুভূতি এনে দেয়,।

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই।

আমার ভক্তি যেবা পায়, তারে কেবা পায়

সে যে সেবা পায় হয়ে ত্রিলোকজয়ী।

শুন চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা কই, মুক্তি মিলে কভু ভক্তি মিলে কই।

ভক্তির কারণে পাতাল ভবনে বলির দ্বারে আমি দ্বারী হয়ে রই।

শুদ্ধা ভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে।

গোপ-গোপী বিনে অন্যে নাহি জানে।

ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে, পিতা জ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই।।

ভগবান ভক্তির বিস্তারে যেমন বিচারী, তেমনই আবার ভক্তির সহজ অধিকার হয়েছে নিশ্চিত। যে প্রাণে জন্মেছে সহজ আহ্বান, মূর্ত আকর্ষণ, নিত্য বিচারদ্বারা ভগবানকেই একমাত্র করে তোলা, ঐ প্রাণের কাছে তিনি সহজ, উন্মুক্ত। সহজ সরল আকুতিতে যে বরণ করেছে মাকে, মায়ের অঙ্গনে যে হয়েছে অনবদ্য এক স্থায়ী অনুসারী, তাকে বরণ করেছেন ঐ দিব্যমাতা স্বয়ং। ভক্তির স্রোত এখানে হয়েছে উন্মোচিত। ভক্তির এই স্রোত ক্রমে বেগবতী হয়ে হরণ করে নেয় যা কিছু জাগতিক প্রভাব ও প্রবাহকে।এই ক্ষণে ভাগবতী উন্মেষ হয়ে ওঠে অখণ্ড। ভাগবতী উন্মেষের এই ক্ষণটি শুধু প্রত্যয়ের জন্য নয়, এই ক্ষণটি প্রত্যয় এবং অভীপ্সাকে এমন এক আকর্ষণে পরিণত করে যায়, সব সংবেদকে পেরিয়ে এটি ধাবিত হয় ঐ পরম ক্ষেত্রে। ভক্তিদেবী স্বয়ং এখানে হয়ে ওঠেন কৃপাকারী। স্বয়ং ভক্তিদেবীই ঐ কৃপার দ্বারকে উন্মোচন করেন মূর্ত আবেগ ও আগ্রহে। ভক্ত এসময়ে শুধু ভগবত্তার আবেশেই আপ্লুত হয়ে বিরাজ করেন ভক্তির শাশ্বত পথে। এ সময়ে সবই হয়ে ওঠে দিব্য। দৃষ্টি, শ্রুতি সবই দেববৎ হয়ে ওঠে।

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ ভদ্রং পশ্যেম অক্ষভি যজত্রাঃ।

স্থিরৈ অঙ্গৈ তুষ্টুবাংস তনুভিঃ ব্যশেম দেবহিতং যৎ আয়ুঃ।। (যজুর্বেদ ২৫/২১)

ভক্তির পক্কতায় সবই দিব্য সঞ্চারী হয়ে ওঠে। ভক্ত শ্রবন করেন সর্বদা ভগবানের বাণী, তিনি দৃষ্টিতে ভগবানকেই প্রতিভাসিত দেখেন, তাঁর সমগ্র অস্তিত্বের মধ্যে সঞ্চারিত হয় দিব্যভাব আর জীবনের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে থাকে ভাগবতী, জীবনের বর্ধিত পরিধিতে। ভগবানকেই মূর্ত করে তোলে এই জীবন, ভগবানের কাছে সমর্পণকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নিজের সব অনুভূতিকে সংহত করে ভাগবতী প্রত্যয়ে নিষিক্ত করেন। জীবন হয়ে ওঠে মূর্ত, স্বাতন্ত্র্যে বিধৃত। জীবনের সব পর্বে ঐ স্বাতন্ত্র্যকে বরণ করে নিয়ে ভাগবতী অন্বেষায় বিধৃত হয়। ভক্তিলতা জীবনে ব্যাপ্ত হতে থাকে। ভক্তি যখন ব্যাপ্ত হয়ে যায়, পরিপক্ক ভক্তি, মূর্ত ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত

যিনি তাঁকে পূর্ণভক্ত বলা যায়। পূর্ণ ভক্ত প্রেমিক। ভগবৎ প্রেমিক। তিনি বিচারবিহীন, জগতের প্রতি সব ভ্রুক্ষেপ অতিক্রম করেছেন। জগতের ধন, সম্পদ, দায়িত্ব, কর্তব্য, দেশ-কাল-জাতি-পৃথবীর প্রতি দায়িত্ব মুক্ত, এমনকি নিজের ভূত-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভ্রুক্ষেপবিহীন। নিজের, নিজ জনের প্রতি নির্বিকার, নিরাসক্ত। বলা হয়েছে, 'Being in the world, but not belonging to it' এই বিশ্বজনের মত বিরাজ করেন। মানুষের অবয়ব সংজ্ঞায় পড়েন, ঐ সংজ্ঞায় অঙ্গীভূত, অথচ মানব নন। মানুষ পরিচয়কে অতিক্রম করে এক নৈর্ব্যক্তিক, অতীন্দ্রীয় পরিচয়ে বিধৃত, জনক রাজা উপযুক্ত উদাহরণ। অথচ রাজা জনকের মত ব্রহ্মজ্ঞানী জগতে বিরাজ করেও, জগৎ ব্যাপারে নর্বিকার। রাজা জনকের নিজ সম্পর্কে পরিচয় বর্ণনায় বিষয়টি বিধৃত হয়েছেঃ

অনন্তং বত মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।

মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন।। (মহাভারত, শান্তিপর্ব ১৭৮/২)

(আমার ওই বিপুল বিত্ত যেটি বাইরে থেকে দেখে মনে হতে পারে আমার সম্ভার- এটি আমার কিছু নয়। সমগ্র মিথিলা যদি আগুনে দগ্ধ হয়ে যায়, তবুও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না, এর দ্বারা আমার কিছুই এসে যায় না।)

বিশুদ্ধ আত্মনিবেদনঃ ভগবানে আত্মনিবেদনই ভক্তির শ্রেষ্ঠতম পরিণতি। এই অবস্থাটি সাম্যাবস্থাকে অতিক্রম করে যাওয়া। সাম্যাবস্থাকে 'মুনি' বা স্থিতধী অবস্থা বলা হয়েছে। এই অবস্থায় সুখে বা দুঃখে একই অবস্থা মনে বিরাজ করে। যেমন সুখের চাঞ্চল্য স্পর্শ করে না, তেমনি দুঃখের যন্ত্রনায় তিনি বিদ্ধ হন না।

দুঃখেষু অন-উদ্বিগ্ন-মনাঃ সুখেষু বিগত স্পৃহঃ।

বীত-রাগ-ভয়—ক্রোধঃ স্থিতধীঃ মুনিঃ উচ্যতে।। (গীতা ২/৫৬)

(যিনি দুঃখে উদ্বেগ বিহীন, সুখের আকাঙক্ষামুক্ত, যিনি আসক্তি, ভয়, রাগ ইত্যাদির প্রভাব থেকে মুক্ত তাঁকে মুনি বলা হয়েছে; তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ)

মহাত্মা শুকদেব এমন ভক্তের শিরোমণি; স্থিতধী; ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মময়। যোগাভ্যাসের কারণে যখন শুক রাজা জনকের কাছে এসেছিলেন রাজা জনকের রাজ কার্যে যুক্ত থাকা, রাজকীয় পটভূমিতে বিরাজ, রাজকার্যে মনোযোগ দেখে ভেবেছিলেন- বিষয়ের মধ্যে এই ব্যক্তি ডুবে রয়েছেন, তিনি কেমনে ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করবেন! শুকের মনোভাব অনুভব করে রাজা জনক তাঁকে একটি পরীক্ষামূলক কাজ দিলেন। তেল পরিপূর্ণ একটি পাত্রকে হস্তে অবলম্বন করে জনপদ ঘুরে এসে সব বিবরণ দেওয়ার কাজ। শুক সমর্থ হলেন। গোটা জনপদ পরিক্রমা করে এসে সব বর্ণনা রাজা জনককে দিলেন অথচ তৈল পাত্রে তৈল যেমন ছিল তেমন। রাজা জনকের জিজ্ঞাসার উত্তরে শুক তাঁর পারদর্শিতার অন্তর্নিহিত তত্বটি বুঝিয়ে দিলেন। শুক জানলেন- জনপদ দেখবার জন্য যেমন মনোযোগ দিয়েছেন, তেমনি মনটি সবসময় নিবিদ্ধ ছিল ঐ পূর্ণের (তৈল পূর্ণ পাত্র) দিকে। রাজা জনকের অবস্থাটি এবার শুক নিজের উদাহরণ থেকে বুঝে নিলেন। বিশ্বের কার্যাদিতে ব্যাপ্ত থেকে ভক্তির পথে স্থিত থাকা, ব্রহ্ম জ্ঞানে জারিত থাকবার সূত্রটি ভাগবতে বর্ণিত নববিধা ভক্তি ধারার মধ্যে উপযুক্তভাবে নিহিত রয়েছে। নববিধা ভক্তির প্রতিটি বিধানের মধ্যেই রয়েছে ব্যাপ্ত ভগবানের প্রতি আকুতি আত্মনিবেদন নিবেদন। শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-পাদসেবন-অর্চন-বন্দন-দাস্য-সখ্য-আত্মনিবেদন এই নববিধা ভক্তি ধারার অন্তে রয়েছে পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ প্রেমে ভরপুর হয়ে যাওয়া। অত্রি ঋষির সাধন চেতনায় ধরা পড়েছে এমন একটি অবস্থাঃ

যঃ ইম বহন্ত আশুভিঃ পিবন্ত মদিরং মধু।

অত্র শ্রবাংসি দধিরে।। (ঋ। বে। ৫/৬১/১১)

(ঐ চেতন ধারা ঝরণার মত নেমে আসছে, এতে অবগাহন কর, মধুময় এ চেতন পান কর; এর স্পন্দন শ্রবন কর।)

শ্রবন যখন ঐ শাশ্বতী মাতৃনাম প্রাপ্ত হয়, তখনই মায়ের চেতনার ঝর্ণা প্রবেশ করে জীবনে। এ চেতন স্রোত মধুময় হয়ে বিরাজিত হয়। এ চেতন মধু অন্তরে বাইরে মাতৃভাবে ভরিয়ে দেয়। স্নানের দ্বারা যেমন আমরা মুক্ত হই, সব মালিন্য থেকে, তেমনি এই চেতন স্নানের দ্বারা জাগতিক প্রভাবের আবেষ্টন থেকে হয় মুক্ত। ঋষি বলছেন, এ হোল মধুময় চেতন। চেতন স্নানে হৃদয়-মন সব বিশুদ্ধ হয়ে যায়, মায়ের সব দ্যোতনাকে বরণ করে নেয়। ভাগবতী চেতনার এই ঝর্ণা এগিয়ে এসেছে জগতের বুকে- যে চায়, সে পায়। যে চেয়েছে তারই দিকে এসেছে চেতন ঝর্ণার স্রোত। এই চেতন ঝর্ণায় স্নাত হয়ে মন এখন ঐ চেতন মধু পান করে ভাগবতী তৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে ওঠে। ঋষি বলেছেন, এরও পরে প্রয়োজন শ্রবণ সিদ্ধি। শ্রবণে ভগবানের নাম, গুণগান, তাঁর বাণী, তাঁর স্পন্দন প্রবেশ করে জীবনে মনের আলোড়ন তীব্র হয়। স্বাভাবিক স্থিতি থেকে মন স্পন্দিত হয়ে নতুন স্পন্দনকে বরণ করে নেয়। এখন শুরু হয় কীর্তন। কীর্তনের স্পন্দন শ্রবণের গাঢ়তাকে আরও নিবিড় করে। কীর্তনের মধ্য দিয়ে ভক্তের আকুতি ভাগবতী প্রসাদ নিয়ে আসে। মায়ের হৃদয়ে এখন আনন্দের সঞ্চার হয়। কীর্তন ঐ আনন্দ সঞ্চারী। তাই কীর্তন প্রসাদ হল স্মরণ। কীর্তনের দ্বারা ভগবানের যে আনন্দ জাগ্রত হয়, তিনি আনন্দবোধ করেন—এই উপলব্ধিটি একটি লীলা। স্মরণ হল ঐ লীলার স্থায়ী হৃদয়ভিত্তি। তাঁকে এখন হৃদয়ের অভ্যন্তরে বরণ করে নিয়ে স্মরণ করা মাত্র। নিত্য স্মরণ, দীর্ঘ স্মরণ, ক্রমে অখণ্ড স্মরণ। স্মরণ আনে নৈকট্য। এবার পাদসেবনের পটভূমি- ভগবানের চরণসেবা।

শ্রীভগবানের চরণ সেবাঃ শ্রীভগবানের চরণসেবা কেমনে হবে ঐ চরণ সম্পর্কে জ্ঞানোদয় না হয়? চরণ দর্শন, চরণ স্পর্শ পাদসেবার সঙ্গে অঙ্গীভূত। ভগবানের চরণ দর্শন ও চরণ স্পর্শের দ্বারা তাঁকে এখন বরণ করে নেওয়া যাবে। তাঁকে বরণ করতে হবে হৃদয়ে, মনে। হৃদয়ে তাঁকে বরণ ও ধারণ ঐ রাতুল চরণকে আশ্রয় করে। মায়ের ঐ চরণ। যে মা ঐ সৃষ্টির সব প্রয়াসের স্রষ্টা, যিনি সব সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় বিন্যাসকারী। যিনি এইসব কিছু সৃষ্টির অন্তরালে মহান ঐশ্বরী শক্তি- তাঁকে এখন বরণ করতে হবে হৃদয়ে। চিরন্তনী এই মায়ের চরন এখন মার্জন ও চরণ সেবা। সেবার দ্বারা তাঁর তৃপ্তি বিধান। যে চরণ এখন দেখছি আবির্ভূতা ঐ শাশ্বতী আবির্ভাবকে বরণ করে চরণ মার্জনা করতে হবে, এই চরণের কাছে অর্চন ও বন্দন। অর্চনাটির জন্য চাই উপযুক্ত চয়ন- পুস্প চয়ন। মায়ের ঐ রাতুল চরণে অর্চনাটি করতে হবে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সম্ভার দিয়ে। তাঁকে অর্চনা জানাবার জন্য Pluck the best flower of truth from your heart। নিজের হৃদয়ে এখন অনুসন্ধান করতে হবে। ঐ সত্য বৃক্ষের পুস্পাদি- যেগুলি জীবনের সব অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করে এগিয়ে এসেছে এখন পর্যন্ত। এর মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে জীবনের সব সাধন সম্পদ। হে সাধক, ওই সত্য পুষ্পটিকে চয়ন করতে হবে হৃদয়ের পটভূমি থেকে। ঐ ফুলটি তুলে নিয়ে মায়ের পায়ে দিতে হবে। মায়ের ঐ রাতুল চরণে এখন নিবেদন করব আমরা হৃদয়ের সব উপলব্ধি ও অনুভূতির নির্যাস ঐ পুষ্পটি। পুষ্পের নিবেদন দিয়ে যে অর্চণ, সেই অর্চণ তাঁর তৃপ্তির কারণ। এখন বন্দন- মায়ের চরণ বন্দনা করবার এটি পটভূমি। মায়ের চরণ বন্দনায় যে বাণী, যে ছন্দ, যে ব্যাপ্তি যুক্ত আছে সেটিই এগিয়ে নিয়ে যাবে ভক্তির শীর্ষে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। ভক্তির পরিণতিতে রয়েছে মিলন- অবিচ্ছেদ ব্রহ্মজ্ঞানের সবিশেষ পটভূমি। তিনি যে শাশ্বত নিবেদনকে বরণ করেছেন এরই মধ্যে আছে ভক্তির নানা বিস্তার।

দাস্য-সখ্য ও আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে নববিধা ভক্তির পূর্ণতা। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দাস্য ভাবের বর্ণনায় বলেছেন- ওই চরণের আশ্রয়ে এক ধূলিকণা হয়ে বিরাজ করা ও নিত্য স্পর্শে, স্পন্দনে তাঁর সেবায় নিয়োজিত হওয়া। দাস্যপ্রেম জীবনের পটভূমিকে আরও দৃঢ়ভাবে একাত্মার দিকে এগিয়া নিয়ে যায়। সখ্যপ্রেম জাগ্রত হয়

নিশ্চয়াত্মিকা। নিশ্চয়াত্মিকায় বিরহ ব্যাকুলতা স্বভাবজ হয়ে ওঠে। ব্যাকুলতার অন্তিমে মিলন। মিলনে প্রেমপরিপূর্ণ হোল। আত্মনিবেদনে এই প্রেম মূর্ত। মহাপ্রভুর ভাবটি এখানে প্রস্ফুটিতঃ

আশ্লিষ্য বা পাদবতাং পিনষ্টু মা

মদর্শনান্মহতাং করোতু বা।

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো

মৎপ্রাণনাথস্তু স এব না পর।। (শিক্ষাষ্টক-৮, শ্রীচৈতন্য)

(তিনি আমাকে আলিঙ্গন করুন বা পদতলে পিষ্ট করুন, আমাকে দেখা না দিয়ে যদি তিনি আমাকে মর্মাহত করেন, সে লম্পটের যা ইচ্ছা তাই তিনি করুন; তবুও তিনিই আমার প্রাণনাথ, অন্য কেউ নয়।)

কখনও মিলন, কখনও বা বিরহ। মিলনে যেমন আত্মসমাহিত, বিরহেও। মিলনের আনন্দ যেমন উপচে পড়ার মত সমগ্র অস্তিত্বকে ব্যাপ্ত করে ঐ আনন্দ জাগ্রত জাগায় কোষে কোষে শিহরণ মিলনের মধুত্ব। আবার বিরহে রয়েছে অনুপম এক ব্যাকুলতা! মিলনের আনন্দে যে স্পন্দন সমগ্র অস্তিত্বকে আপ্লুত করে দেয়, বিরহের ব্যাকুলতাও তেমনি সমগ্র অস্তিত্বকে ব্যাপ্ত করে বরণ করে নিতে চায় ওই প্রাণনাথকে। ভগবানের সঙ্গে তাই অবিচ্ছেদ্য এক আবর্তে এখন যুক্ত হয়ে যাওয়া মিলনে বিরিহে।আত্মনিবেদনের এই পর্যায়টিই কান্তাপ্রেম সদৃশ। এটি এমন মিলন যে দুটি মন মিলে একাকার হয়েছে। দুটি হৃদয় মিলে একাকার হয়েছে। দুটি সত্তা মিলিত হয়ে একাকার হয়েছে একটি অখণ্ড সত্তায়। মিলনে ও বিরহে উভয়তই রয়েছে প্রেম সঞ্চার। মিলনে প্রেম সঞ্চারটি মাধুর্যমন্ডিত; আর বিরহের প্রেম সঞ্চার হয়েছে প্রেরণায় পরিপূর্ণ। ভক্তিপথের সাধকের পক্ষে এটি চুড়ান্ত পর্ব। প্রভুর কৃপা এবং উপযুক্ততায় এটি সম্ভব।

ভক্তি ও জ্ঞান পথের যে সংঘাত বহু শাস্ত্রকারগণের কলমে প্রতিভাত হয়েছে, সেটির আর কোন প্রয়োগ ক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকে না। ভক্তির শিরোমণি ব্রহ্মজ্ঞান ভিত্তির উপর যেমন রচিত; অপরপক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানদীপ্তি ভক্তির অন্তঃস্থিতি অবস্থার পটভূমিতেই রচিত ভগবানের কৃপাতেই ভক্তি এবং জ্ঞান পূর্ণতায় পৌঁছানো সম্ভব।প্রভুর কৃপায়, মায়ের কৃপায় একাকার হয়ে উঠুক ভগবান ভক্ত।